আমাদের দেশে করোনার গণ টীকার কি কোনো প্রয়োজন আছে?

অনির্বাণ সাহা

আমাদের দেশে করোনা মোকাবিলার লকডাউন চালু হবার পর ছয় মাস পেরিয়ে গেল। প্রথমে যেটা কালান্তক রোগ বলে মনে হচ্ছিল, এখন তা অনেকটাই গা সওয়া। আমাদের আশেপাশে বহু মানুষ নিত্যদিন করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। কেউ টেস্ট করাচ্ছেন। কেউ করাচ্ছেন না, কিন্তু সিম্পটম দেখে চেনা জানা ডাক্তার বলছেন, করোনা। বাড়িতে থেকেই সেরে উঠছেন। প্রথমে যেমন হিসেব পাওয়া যাচ্ছিল, একশ' জন আক্রান্তের মধ্যে দশজন মারা যাচ্ছে এখানে, এখন দেখা যাচ্ছে, আক্রান্তের মধ্যে মৃতের অনুপাত এক-এর আশেপাশে। যদি টেস্ট করাচ্ছেন না, এমন মানুষকেও হিসেবের মধ্যে আনতে হয়, তাহলে আক্রান্ত পিছু মৃত-র অনুপাত একের অনেক কম-ই হবে। আগে করোনায় কেউ মারা গেলে, তার দেহ বাড়ির লোকেদের দেওয়া হচ্ছিল না। সৎকার করছিল প্রশাসন। এখন করোনায় কেউ মারা গেলে তার দেহ বাড়ির লোকেদের দেওয়া হচ্ছে।

করোনা ও টীকা সংক্রান্ত আলোচনায় ঢোকার আগে বলে নেওয়া যাক, করোনা বা কোভিড ১৯ নিয়ে প্রায় এক লক্ষ অ্যাকাডেমিক পেপার (১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডেটাবেস দেখাচ্ছে, ৮৯,০৬৪) বেরিয়ে গেছে এর মধ্যে। অতি দ্রুত আরো বেরোবে অনেক। এর অনেকগুলিই পিয়ার রিভিউ হওয়া। মানে বিশেষজ্ঞরা সেই পেপারের পান্ডুলিপি চুলচেরা বিচার করে ছাড়পত্র দিয়েছেন জার্নালে ছাপা হবার। আর পিয়ার রিভিউ না হওয়া, কিন্তু নানা আর্কাইভে প্রকাশিত প্রচুর পেপার রয়েছে। পেপার ছাড়াও আছে রিপোর্ট, প্রেস রিলিজ, ইন্টারভিউ। সেগুলির গুরুত্বও কম নয়। এবার এইসব প্রকাশিত সামগ্রীর মধ্যে সবাই যে ঠিক বলছেন তা নয়। অনেকে গুপিতাপা-ও দিচ্ছেন। যেমন, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ওষুধটি দিয়ে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা করলে রোগীর মারা যাবার সম্ভবনা বেড়ে যায় -- এইরকম একটা গবেষণাপত্র পিয়ার রিভিউ হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল জগদবিখ্যাত দি ল্যান্সেট বলে পত্রিকাটিতে। তারপর দেখা গেল, সেই গবেষণাপত্রে যে পেশেন্ট ডেটাবেস ব্যবহার করা হয়েছে, তা একটি প্রাইভেট কোম্পানি সরবরাহ করেছে গবেষকদের। সেই ডেটাবেসে ভেজাল আছে। তারপর গবেষণাপত্রটি ফিরিয়ে নেয় পত্রিকাটি। কিন্তু গবেষণাপত্রটির এমনই দাপট হয়েছিল, এর জের-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড ১৯ চিকিৎসায় হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন-এর ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ফেলেছিল। যাই হোক, পরে অবশ্য নানা গবেষণা দেখায়, এই ওষুধটি কোভিডে যে খুব কাজ দিচ্ছে, এমন নয়। প্লাসিবো বা ওষুধের মতো দেখতে কিন্তু আসলে চিনির দানা, তার মতোই এর ভূমিকা।

এতো গেল কারচুপির কথা। অনেক বিখ্যাত পেপার অঙ্ক কষে করোনার বিস্তার ও সমাপ্তির রেখাচিত্র দিয়েছিল, এবং লকডাউন করলে কত উপকার হবে তা বলেছিল। বস্তুত প্রথম দু-এক মাস এই ধরনের গবেষণাপত্রের উৎপাদন ও কাটতি ছিল খুবই বেশি। এবং বেশিরভাগ গবেষণাপত্রেই কড়া ধাঁচের লকডাউন করে করোনার বিস্তার আটকে দেওয়া যাবে, এটা নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, ভারত নিয়ে একটা গবেষণাপত্রে বলা হয়েছিল, টানা পঁয়তাল্লিশ দিন লকডাউন করলে মাত্র কয়েক লক্ষ আক্রান্ত হবার মধ্যে দিয়েই করোনা দূর হবে। সেই গবেষণাপত্রে গালভরা বয়স-বিচার অনুঘটক বা ফ্যাক্টর দেখানো হয়েছিল। তাতে দেখানো হয়েছিল, ভারতে করোনার ছড়ানোর হার বা রিপ্রোডাকশন রেট অনেক বেশি হবে, কারণ ভারতে তিন প্রজন্ম যেহেতু একসাথে থাকে, তাই বয়স্ক ও শিশুদের একই বাড়িতে থাকার কারণে ছড়ানোর হার অনেক বেশি হবে। যাই হোক, অন্ততঃ দু-মাস সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কড়া লকডাউন সত্ত্বেও ভারতে করোনার ছড়িয়ে পড়া আটকানো যায়নি। চীন বাদে (এছাড়া নিউজিল্যান্ড শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র) আর প্রায় কোথাওই করোনার ছড়িয়ে পড়া বা গোষ্ঠী সংক্রমণ

আটকানো যায়নি। প্রথম দু-এক মাসের ওইসব পেপার দেখলে সেগুলির লেখকরা এখন নিজেরাই লজ্জিত হবেন আশা করা যায়। অবশ্য অ্যাকাডেমিক্স এমন একট জায়গা, যার কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। পেপার বেরোলে অ্যাকাডেমিক স্কোর বাড়ে। তা তাতে ছাইপাশ যাই লেখা থাকুক। তা সমাজের কাজে লাগুক বা না লাগুক বা অপপ্রয়োজনীয় হোক। এটা অ্যাকাডেমিক্সের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে সেটা আর অ্যাকাডেমিক্স থাকে না। পেপারে ভুল লিখলে যদি গর্দান যায় বা চাকরি বা জলপানি, তাহলে সেই জমানা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাবে। গবেষণা চুলোয় যাবে।

কিন্তু, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারক, কারোর কাছেই এই প্রকাশিত গবেষণা বা রিপোর্টগুলির চেয়ে অন্য কোনো জ্ঞানের আকর নেই। ব্যক্তিগতভাবে কার কী মনে হয়, তা নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তিবিশেষ বা তার ভক্তদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই প্রকাশিত গবেষণা, রিপোর্ট এবং এখনও অবদি বিজ্ঞান যেটুকু যা জানতে পেরেছে, তার ওপর দাঁড়িয়েই আমাদের ওপরের প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে হবে। একই সাথে সেগুলোর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ কিছু অনুমানও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এক লক্ষ গবেষণাপত্র পড়া অসম্ভব। এবং এক লক্ষ গবেষণা পত্র যে সমস্ত দিকে আলোকপাত করতে পেরেছে, তাও না হতে পারে। ফলতঃ আলোচনায় অনুমানের গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু গবেষণালব্ধ তথ্য যথেষ্ট নয়। আরো বলা দরকার, কোভিড ১৯ নিয়ে মানুষের জ্ঞানগম্যি বদলাতে বদলাতে যাচ্ছে, যেহেতু এই অতিমারীটি ঘটছে এখন। ফলতঃ ওপরের প্রশ্নটার যে উত্তর দেবার চেষ্টা করা হবে, তা এখনকার ‘জ্ঞানগম্যির অবস্থা’ বা স্টেট অফ নলেজ-এর ওপর দাঁড়িয়ে। যদি অতিমারীর শুরুর দিকে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা হত, তাহলে হয়ত উত্তরটা অন্যরকম হত।

উত্তর ইতালির লম্বার্ডি অঞ্চলের বেরগামো প্রদেশের হিসেব

ইতালির লম্বার্ডি অঞ্চলের বেরগামো প্রদেশ মার্চ মাসে করোনার প্রকোপের জন্য শিরোনাম হয়েছিল। সেই শহরে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে শেষ হওয়া একটি অ্যান্টিবডি সমীক্ষায় দেখা যায়, ৫৭% লোকের দেহে কোভিড অ্যান্টিবডি রয়েছে। ধরে নেওয়া যায়, কোভিড অ্যান্টিবডি তৈরি হতে ২০ দিন সময় লাগে। মানে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই ৫৭ শতাংশ লোক সংক্রামিত হয়ে গেছিল ওই প্রদেশে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেরগামো প্রদেশের জনসংখ্যা ১১ লক্ষের মতো, মানে ৬ লক্ষের বেশি লোকের দেহে সংক্রমণ হয়ে গেছিল। সেই তুলনায় জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বেরগামো-তে কোভিড কেস-এর সংখ্যা ছিল মোট ১৩৬০৯। মানে সংক্রামিত-র সংখ্যা ছিল কেস-এর প্রায় পঞ্চাশ গুণ।

৩ এপ্রিল ইতালির সর্বোচ্চ আক্রান্ত প্রদেশ হিসেবে উঠে আসে বেরগামো (মোট ৯৩১৫)। সেপ্টেম্বর মাসে সংখ্যাটা দৈনিক ১৫-র আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে, তবে কয়েকদিন ১০ এর কম এবং কয়েকদিন ২০ -র বেশিও হয়েছে। গোটা লম্বার্ডি অঞ্চলে দৈনিক মৃত্যু পাঁচের নিচেই ঘোরাফেরা করেছে। বেরগামোর মৃত্যুর আলাদা পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। তবে খুবই কম মৃত্যু সেখানে হয়েছে ধরে নেওয়া যায় (এমনকি হয়নি ধরে নেওয়াই সঙ্গত), কারণ লম্বার্ডি অঞ্চলের নতুন কেস-এর নিরঙ্কুশ বেশিরভাগই মিলান-এর। আগস্ট মাসের প্রথম পনেরো দিন বেরগামোতে নতুন কেস সংখ্যা দৈনিক দশের কম ছিল, তবে আগস্টের মাঝামাঝি থেকে সেটা বেড়ে দৈনিক গড়ে ১৫-২০ র মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে। লম্বার্ডি অঞ্চলে আগস্ট মাসে মৃত্যুর সংখ্যা দৈনিক এক দুই জনের বেশি নয়। তবে এই মাসে বেরগামো প্রদেশ লম্বার্ডি অঞ্চলের অন্যতম আক্রান্ত প্রদেশ। ফলতঃ এই মাসে বেরগামো থেকে কেউ কেউ মারা গেছে ধরে নেওয়া যায়। জুলাই মাসের প্রথম পনেরো দিন বেরগামোর দৈনিক নতুন কেস সংখ্যা গড়ে ৩০ এর আশেপাশে ঘোরাফেরা করলেও শেষের পনেরো দিন সংখ্যাটা গড়ে ১৫-র নিচে নেমে যায়। কিছু মৃত্যুও হয় দৈনিক। জুন মাসের শেষের পনেরো দিন সংখ্যাটা গড়ে ৩০ এর বেশি ছিল, এবং মাঝে মাঝে তা কয়েক দিন তা ৫০ ছাড়িয়ে গেছিল। জুন মাসের প্রথম পনেরো দিন সংখ্যাটা গড়ে ৪০ এর একটু কম ছিল এবং মাঝে

মাঝে কয়েকদিন তা ৭০ এর ঘর ছুঁয়েছিল। মে মাসে মাঝে মাঝে দৈনিক কেস সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায় এবং গড়ও ছিল ৭০ এর কাছাকাছি।

বেরগামো প্রদেশে ১৭ সেপ্টেম্বর মোট কেস সংখ্যা ছিল ১৫,৬৪৪। ১ সেপ্টেম্বর মোট কেস সংখ্যা ছিল ১৫,৩৯১। ১ আগস্ট ছিল ১৫০৩৬। ১ জুলাই ছিল ১৪,৩৯৭। ১ জুন ছিল ১৩,৩৭৪। ১ মে ছিল ১১,৩৬০। ১ এপ্রিল ছিল ৯০৩৯। ১ মার্চ ছিল ২০৯। অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে গড় দৈনিক কেস ১৪ র মতো। আগস্ট মাসে গড় দৈনিক কেস ১২-র মতো। জুলাই মাসে গড় দৈনিক কেস ২১ এর মতো। জুন মাসে গড় দৈনিক কেস ৩৪ এর মতো। মে মাসে গড় দৈনিক কেস ৬৭ এর মতো। এপ্রিল মাসে গড় দৈনিক কেস ৭৭ এর মতো। মার্চ মাসে গড় দৈনিক কেস ছিল ২৯০ এর মতো। ফেব্রুয়ারি মাসে গড় দৈনিক কেস ছিল ৬ এর মতো।

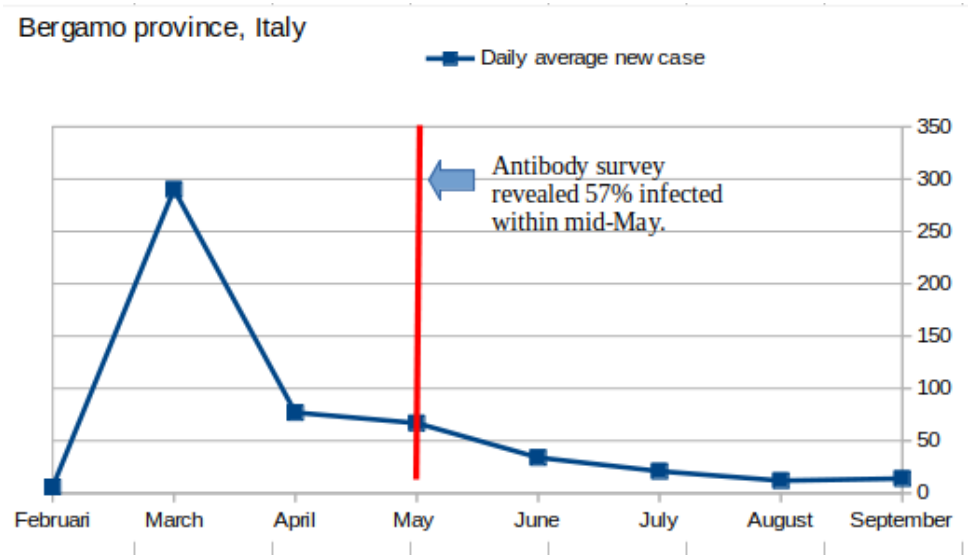

ছবি ১ : ইতালির বেরগামো প্রদেশের রেখাচিত্র বেরগামো প্রদেশ প্রশাসনের টুইটার থেকে নেওয়া।

মার্চ মাসে বেরগামো প্রদেশে মোট মৃত্যু গত বছরের তুলনায় পাঁচ গুণের বেশি হয়। ধরে নেওয়া যায়, এই অতিরিক্ত মৃত্যুর জন্য দায়ী কোভিড। যা কোভিডে মৃত্যুর সরকারি পরিসংখ্যানের চেয়ে বেশি, প্রায় দ্বিগুণ। অতএব মৃত্যুর পরিসংখ্যানের ওপর বেশি নির্ভর করা ঠিক নয়। যদিও মৃত্যুর অফিশিয়াল পরিসংখ্যানের দিক থেকেও মার্চ সবচেয়ে এগিয়ে, তারপর এপ্রিল। একইভাবে কেস এর সংখ্যার ওপরও বেশি নির্ভর করা ঠিক নয়। ধরেই নেওয়া যায়, প্রথম দিকে (ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল) ক্লিনিকাল কেসগুলিও ধরা পড়েনি। কিন্তু পরের মাসগুলিতে, যেমন মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর -- সমস্ত ক্লিনিকাল কেসই ধরা পড়েছে। ফলে ওপরের রেখাচিত্রে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিলের পয়েন্টগুলি আরো ওপরে হবার সম্ভবনা, কিন্তু মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বরের পয়েন্টগুলি যথাযথ।

তাহলে বেরগামো প্রদেশের হিসেব থেকে কী বোঝা যাচ্ছে? এই প্রশ্নে আসার আগে, বেরগামো প্রদেশ তথা লম্বার্ডি অঞ্চলে কোভিড ১৯ এর ছড়ানোর হার বা রিপ্রোডাকশন রেট (একজনের থেকে গড়ে কতজনের হচ্ছে) কত সে তথ্য জরুরি। কারণ, বেরগামো প্রদেশে হার্ড ইমিউনিটির জন্য কত শতাংশ অধিবাসীর দেহে সংক্রমণ ছড়াতে হবে, সেই পরিসংখ্যান নির্ভর করে এই ছড়ানোর হারের ওপর। ছড়ানোর হারের অনন্যক-কে ১ থেকে বাদ দিলে যা হয়, তাকে ১০০ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় হার্ড ইমিউনিটি বা গোষ্ঠীবদ্ধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রয়োজনীয় শতাংশ। লম্বার্ডি অঞ্চলে লকডাউন শুরু হয় ৮ মার্চ। সেই সময় রিপ্রোডাকশন রেট ছিল ৩ এর মতো। পরে তা কমতে থাকে। এই সময়কার রিপ্রোডাকশন রেট-ই ব্যবহার করা উচিত গোষ্ঠীবদ্ধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রয়োজনীয় শতাংশ হিসেব করার সময়। সেক্ষেত্রে গোষ্ঠীবদ্ধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা হার্ড ইমিউনিটির জন্য প্রয়োজন ৬৭% অধিবাসীর দেহে কোভিড সংক্রমণ। ১১ মে ইতালিতে লকডাউন শিথিল করা হয়। ওই সময় অবদি সংক্রমণই অ্যান্টিবডি সার্ভেতে ধরা পড়েছে, যা দেখাচ্ছে বেরগামো-তে ৫৭% এর দেহে সংক্রমণ ঘটেছে। অতএব তখনও হার্ড ইমিউনিটির জন্য প্রয়োজনীয় সংক্রমণের জন্য আরো ১০ % অধিবাসীর

দেহে বা আরো এক লক্ষের একটু বেশি বেরগামোবাসীর (বেরগামো-র জনসংখ্যা ১১ লক্ষ-র একটু বেশি) দেহে সংক্রমণ প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে, কেস পিছু সংক্রমণ পাঁচ গুণ। সেটা লকডাউনের মধ্যের হিসেব। আশা করা যায়, লকডাউনের পরেও সেটাই বহাল থাকবে। যদিও টেস্ট সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু একই সাথে লকডাউন উঠে যাবার ফলে সংক্রমণের সুবিধাও বেড়েছে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর এই এখন সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ অবদি বেরগামোয় কেস-এর সংখ্যা বেড়েছে ৩৬০০ -র মতো। অর্থাৎ, পাঁচ গুণ সংক্রামিত ধরলে তার পর থেকে সংক্রামিত হয়েছে আরো আঠারো হাজারের মতো। যা এক লক্ষ্যের চেয়ে বেশ কম। এবং এই হারে সংক্রমণ চললে, অর্থাৎ চার মাসে (মে -র দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ) আঠারো হাজার বা মাসে চার হাজার হিসেবে ধরলে (যেহেতু গড় দৈনিক কেস সংখ্যা প্রতিমাসেই কমতে কমতে গেছে, তাই মাসে সাড়ে চার হাজারের বদলে চার হাজার সংক্রামিত ধরা হল) আরো ২০ মাস বা দেড় বছরেরও বেশি লাগবে বেরগামোর গোষ্ঠীবদ্ধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে। কিন্তু লাগার কথা আরো বেশি সময়। কারণ, যত গোষ্ঠীবদ্ধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার দিকে এগোবে, তত সংক্রমণের হার কমে যাবে। এবং স্বাভাবিক সংক্রমণের মধ্যে দিয়ে সেই জায়গায় পৌঁছতেই পারবে না । অঙ্কের ভাষায় বললে, কার্ভটা অ্যাসিমটোটিক। তবে বেরগামো প্রদেশের লোকেদের বাইরে যাতায়াত প্রবল বেশি। সেখানে প্রদেশের বাইরে থেকে লোক আসা যাওয়াও অনেক বেশি। হার্ড ইমিউনিটির যে অঙ্কের কথা ওপরে বলা হল, তা কোনো একটা বদ্ধ জনগোষ্ঠীর, অর্থাৎ যেখান থেকে বাইরে লোকে যাচ্ছে না, বা বাইরে থেকে লোক সেখানে আসছে না। কিন্তু বাস্তবে যেহেতু বাইরে থেকে লোকের আসা যাওয়া আছে, তাই সংক্রমণের এই অ্যাসিমটোটিক কার্ভ হবে না পুরোটা। সংক্রমণ একটি বদ্ধ জায়গায় যে হারে হবার কথা হার্ড ইমিউনিটির কাছাকাছি পৌঁছে গেলে, তার চেয়ে বেশি হারে হবে। তাই হয়ত দেড় বছরের মধ্যেই হার্ড ইমিউনিটির জন্য প্রয়োজনীয় শতাংশ অর্জিত হয়ে যাবে। হিসেবের সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিতে পারি, সংক্রমণের কার্ভ বা রেখচিত্রের অ্যাসিমটোটিক হবার কারণে যে বেশি সময় লাগার কথা, এবং বদ্ধ অঞ্চলের প্রাকস্বীকার্যের যে আদর্শ দশা তা না থাকার কারণে যে কম সময় লাগার কথা -- এই দুইটি কাটাকুটি হয়ে যাচ্ছে, এবং দেড় বছরের মতোই লাগছে গোষ্ঠীবদ্ধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা হার্ড ইমিউনিটি অর্জিত হতে।

কিন্তু এই একই কারণে গোষ্ঠীবদ্ধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হয়ে গেলেও যারা প্রদেশের বাইরে যাচ্ছে, বা বাইরে থেকে আসা মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশছে, তারা আগে সংক্রামিত না হয়ে থাকলে সংক্রামিত হয়ে যেতে পারে, যদিও সম্ভবনা বেশ কম। বেরগামো প্রদেশের গোষ্ঠীবদ্ধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাকে সেক্ষেত্রে বাঁচাতে পারবেনা। তবে ইতালি এবং ইউরোপ গোটাটাই যখন গোষ্ঠীবদ্ধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন অর্জন করে ফেলবে, তখন বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করলেও সংক্রামিত হবার সম্ভবনা অনেক অনেক কম থাকবে। প্রায় থাকবেই না বলা চলে। সবদিক বিবেচনা করে, বেরগামো প্রদেশের ক্ষেত্রে, আগামী মাস তিনেকের মধ্যে যদি টীকা বেরিয়ে যায়, তাহলে আগে-সংক্রামিত-না-হওয়া হাজার পঞ্চাশেক লোককে (অর্থাৎ ৫ শতাংশ বেরগামোবাসী) টীকা দেওয়া খারাপ হবে না। যদিও তার আদৌ দরকার আছে কি না সেই প্রশ্ন আসবে, কারণ ইদানিং দেখা যাচ্ছে, কেস-এর তুলনায় বেরগামো প্রদেশে মৃত্যু খুবই কম, কখনও কখনও শূণ্য বলেও মনে হচ্ছে। এবং কেস-এর ভয়াবহতাও বেশ কম। টীকা দেওয়ার দরকার আছে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে এইটা একটা নতুন ফ্যাক্টর।

কোভিড আক্রমণের ভয়াবহতা যত দিন যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে

‘করোনা আক্রান্ত’ কাকে বলা হবে? এই নিয়ে বিতর্কও উঠে গেছে। জুন মাসের শুরুর দিকে ইতালির লম্বার্ডি এলাকার মিলান-এর একটি হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার জানান, সেই সময় ইতালিতে করোনা আক্রান্তদের সোয়াবে যে পরিমাণ ‘ভাইরাল লোড’ পাওয়া যাচ্ছে, তা মাস দুয়েক আগে (মানে মার্চ এপ্রিলে) আক্রান্তদের সোয়াবে যা পাওয়া যাচ্ছিল,

তার তুলনায় খুবই অল্প। তিনি বলেছিলেন, "বাস্তবে ক্লিনিক্যালি ভাইরাসটি আর ইতালিতে নেই"। যদিও এই দাবির সঙ্গে সঙ্গেই তা খারিজ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, কোভিড-এ সংক্রামিত আর আক্রান্ত -- এই দুইয়ের মধ্যে তফাত আছে।

আমাদের দেহে লক্ষ লক্ষ জীবানু ঢোকে এবং থাকে। বেশিরভাগ সময়ই সেই সব সংক্রমণ দেহে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। ফলতঃ এগুলিকে আক্রমণ বলা যায় না, যদিও সংক্রমণ। আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করলেও তা উদ্বেগজনক কিছু হয় না। সেক্ষেত্রেও আক্রমণ না বলে সংক্রমণ বলাই সঙ্গত। অতএব আমরা এইভাবে একটা প্রকারভেদ করতে পারি। ক) সংক্রামিত এবং খ) আক্রান্ত। ইতিমধ্যে আরেকটা স্তরবিভাজন ওপরের পরিচ্ছদে করা হয়েছে। ক) কেস এবং খ) সংক্রামিত। সংক্রামিত-র সংখ্যাটা নমুনাভিত্তিক, পরম ভাবে মাপা সংখ্যা নয়। আমাদের ধরে নিতে হবে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যতই 'টেস্ট টেস্ট টেস্ট' বলে লাফাক, সংক্রামিত-র পরম সংখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। অ্যান্টিবডি নমুনা সমীক্ষার মাধ্যমে একটা আন্দাজ সংখ্যাই কেবল পাওয়া যাবে। এবার কেস ও আক্রান্ত এই দুই স্তরের বিবাদ সামলানো যাক।

আরটিপিসিআর টেস্টের মাধ্যমে এবং র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে কেস-এর সংখ্যা নির্ধারন করা হচ্ছে। বিজ্ঞানী মহলে ধরে নেওয়া হয়, আরটিপিসিআর টেস্ট হল কোভিড হয়েছে কি না তা মাপার শ্রেষ্ঠ উপায়। আর র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে পঞ্চাশ শতাংশের মতো ফলস নেগেটিভ আসে। অর্থাৎ, র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে যা কেস পাওয়া যায়, তার তুলনায় কেস সংখ্যা দ্বিগুণ ধরে নেওয়া যায়।[1] পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মোট টেস্টের মধ্যে আরটিপিসিআর এবং র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। ধরে নেওয়া যেতে পারে, সারা দেশেও তাই, কারণ একই ধরনের আমলাতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে এই কোন টেস্ট কত হবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। অতএব, আরটিপিসিআর হল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বা সবচেয়ে ভালোভাবে কোভিড কেস ধরতে সক্ষম ধরে নিলে, মোট কেস সংখ্যা যা হিসেব দেওয়া হচ্ছে, তার দেড়গুণ দাঁড়ায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টিং শুরু হয়েছে দেরিতে। দিল্লিতে ১৫ জুলাই শুরু হলেও সারা দেশে আরেকটু দেরিতে শুরু হয়। আস্তে আস্তে আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তা মোট দৈনিক টেস্টের পঞ্চাশ শতাংশে পৌঁছয়। ধরে নেওয়া যেতে পারে, জুলাই অবদি যে কেস সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, তা টেস্ট পিছু যথাযথ কেস সংখ্যা। এবং আগস্ট থেকে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টিং মোট দৈনিক টেস্টের পঞ্চাশ শতাংশ হওয়ায় টেস্ট পিছু কেস সংখ্যা দেড়গুণ। অতএব বর্ধিত টেস্টের যে বড়াই, তাকে দেড়গুণ ছেঁটে দেওয়া যায়।

যাই হোক, কেস ও আক্রান্তের বিবাদ মেটানোর প্রসঙ্গে আসা যাক। আমাদের দেশে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের তরফে বারবার বলা হচ্ছে, মোট কেস-এর প্রায় ৮৫ শতাংশের হয় কোনো উপসর্গ নেই বা মৃদু উপসর্গ আছে। অতএব এগুলিকে আক্রান্ত বলে স্তর বিভাজন করা যায় না। এগুলোকে সংক্রামিত বলাই সঙ্গত। মোট 'সক্রিয়'-র মধ্যে কত জন হাসপাতালে আছে, সেই শতাংশটাও এর কাছাকাছি। উদাহরন স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের ১৯ সেপ্টেম্বরের তথ্য। হয়ত দেশের প্রথম এক দুই লক্ষ আক্রান্তের ক্ষেত্রে টেস্টের সংখ্যা কম ছিল বলে এই শতাংশটা বেশ কম ছিল। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ আক্রান্ত এখন। তার তুলনায় ওই দুই তিন লক্ষ আর কতটা! তবু আমরা এটাকে ফ্যাক্টর ধরব। আমাদের দেশে মে মাসের ২০ তারিখ কেস সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। আর জুন মাসের ৩ তারিখ ২ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। মে মাস অবদি ছিল লকডাউন। মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে কোভিড কম ছড়িয়েছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। মার্চে জাস্ট শুরু হচ্ছে, সে জন্য। এপ্রিল ও মে মাসে লকডাউনের জন্য। পরিভাষায়

1 *কিন্তু সম্প্রতি আমাদের দেশের একটি সংবাদপত্র রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, কোনো কোনো রাজ্যে আরটিপিসিআর টেস্টে সংক্রমণের যে হার পাওয়া যাচ্ছে (অর্থাৎ প্রতি ১০০ টেস্টে যে ক'টি কেস পাওয়া যাচ্ছে), তার তুলনায় র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে সংক্রমণের হার বেশি পাওয়া যাচ্ছে। এই উদ্ভট কান্ডটি ঘটার কারণ হিসেবে এই রিপোর্টে চিহ্নিত করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ঠ রাজ্যগুলি ল্যাব টেকনিশিয়ানদের আরটিপিসিআর টেস্ট করতে পারার অক্ষমতাকে।*

যাক গে, এগুলিকে সাময়িক ত্রুটিবিচ্যুতি ধরে নেওয়া যাক এবং অবহেলা করা যাক।

বললে, আমাদের দেশে গোষ্ঠী সংক্রমণ গড় হিসেবে জুন মাস থেকে শুরু হয়েছে ধরে নেওয়াও যেতে পারে। তার আগে হয়ত কয়েকটি পকেটে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে (মুম্বই দিল্লি কলকাতা চেন্নাই বাঙ্গালোর), কিন্তু দেশজুড়ে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়েছে জুন মাস থেকে।

তবে সেই আলোচনায় ঢোকার আগে, আমরা আগের সংক্রামিত ও আক্রান্তের ফারাক-রেখাটা স্পষ্ট করে টেনে নিই। হাসপাতালে ভর্তি হলেই যে সিরিয়াস কেস, সেটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অন্ততঃ বলা যাবে না। এর অনেক কারণ আছে। সিরিয়াস কেস একমাত্র ধরা যেতে পারে, যখন রোগীকে অক্সিজেন দিতে হচ্ছে, আইসিইউ-তে রাখতে হচ্ছে বা ভেন্টিলেটরে দিতে হচ্ছে। অতএব শ্রেণীবিভাজনটা হল -- **ক) আক্রান্ত হল হল মোট সক্রিয় কেস সংখ্যার কত শতাংশ অক্সিজেন, আইসিইউ বা ভেন্টিলেটরে আছে। খ) সংক্রামিত হল অ্যান্টিবডি সমীক্ষায় যত শতাংশ পাওয়া যাচ্ছে (যে সময় সমীক্ষা করা হয়েছে, তার ২০ দিন আগে)।**

২৮ এপ্রিল থেকে আমাদের দেশে কোভিড আক্রান্তদের মধ্যে যাদের উপসর্গ খুবই কম বা নেই, তাদের হাসপাতালের বদলে বাড়িতে বা ‘সেফ হোম'-এ রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। তার আগে পর্যন্ত হাসপাতালেই রাখা হচ্ছিল। ২০ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দফতর জানায়, ৮০ শতাংশ কোভিড কেস মৃদু উপসর্গ যুক্ত বা উপসর্গ বিহীন। জুন মাসের ৩ তারিখ দিল্লি এইমস-এর ডিরেক্টর গুলেরিয়া জানান, ভারতে ৯০ শতাংশ কেসই মৃদু উপসর্গ যুক্ত বা উপসর্গ বিহীন। এবং একই সাথে উনি জানান, এখনও গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়নি। উল্লেখ্য ওই জুন মাসের ৩ তারিখেই আমাদের দেশে করোনা কেস ২ লক্ষ ছাড়ায়। ১৫ সেপ্টেম্বর এর তথ্য অনুযায়ী ভারতে মোট ১০ লক্ষ সক্রিয় কেস এর মধ্যে ৩.৫% এর অক্সিজেন লাগছে, ২.২% এর আইসিইউ লাগছে, এবং ০.৩% এর ভেন্টিলেটর লাগছে। অর্থাৎ **সক্রিয় কেস-এর** মোট ৬ শতাংশ কেস আক্রান্ত বলা যেতে পারে। ২৩ জুনের রিপোর্ট অনুযায়ী, মোট ২ লক্ষ সক্রিয় কেসের মধ্যে ২.৯৯% এর অক্সিজেন লাগছে, ২.৫৭% এর আইসিইউ লাগছে, এবং ০.৫৪% এর ভেন্টিলেটর লাগছে। অর্থাৎ **সক্রিয় কেস-এর** মোট ৬.১% আক্রান্ত বলা যেতে পারে। অর্থাৎ আক্রান্ত শতাংশ একই থাকছে।

কিন্তু জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বর মাস অবদি টেস্টিং অনেক বাড়ানো এবং কেস সংখ্যা প্রায় ২০ গুণ হবার পরও, এর কারণ কী? একটি মাত্র কারণই হতে পারে। **জুন মাস অব্দি খুব নির্দিষ্ট কিছু পকেট ছাড়া গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়নি।** যে যে জায়গাগুলিতে জুনের আগে গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়েছিল, সেখানে বস্তুত লকডাউন শুরুর অনেক আগেই গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছিল। ফলে সেখানে ভাইরাসের ভয়াবহতা, যা ইতালির বেরগামো প্রদেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে , দ্বিতীয় মাসে সর্বোচ্চ হয়ে তৃতীয় মাসে কমতে শুরু করে (ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল), তা হচ্ছিল জুন মাসের শুরুর দিকে। অর্থাৎ দিল্লি, মুম্বই, আহমেদাবাদ, চেন্নাই, কলকাতা, পুনে, বাঙ্গালোর -- এইসব জায়গায় যেখানে মার্চের শুরু থেকেই গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছিল, সেখানে এপ্রিল-মে মাস জুড়ে লকডাউনের মধ্যেও গোষ্ঠী সংক্রমণ চলছিল এবং মে মাসের শেষের দিক থেকে ভাইরাসটির ভয়াবহতা কমতে শুরু করেছিল। যার প্রভাব পড়ছিল জাতীয় তথ্যে। কিন্তু জুন মাসে সারা দেশ জুড়ে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে যাওয়ায় অনেকগুলি জায়গাতেই নতুন জনগোষ্ঠী পেয়ে ভাইরাসটি ভয়াবহতা নিয়ে হাজির হয় এবং এই **নতুন নতুন ভৌগলিক জনপদে গোষ্ঠী সংক্রমণের শুরুয়াৎ এই সেপ্টেম্বর মাসেও ঘটে চলেছে।** সেই সব জায়গায় স্বাভাবিকভাবেই ভাইরাসটির ভয়াবহতা বেশি থাকছে, যদিও পুরনো জায়গাগুলিতে কমছে। সব মিলিয়ে সক্রিয় কেস এর সংখ্যার মধ্যে আক্রান্তের জাতীয় শতাংশ একই থাকছে।

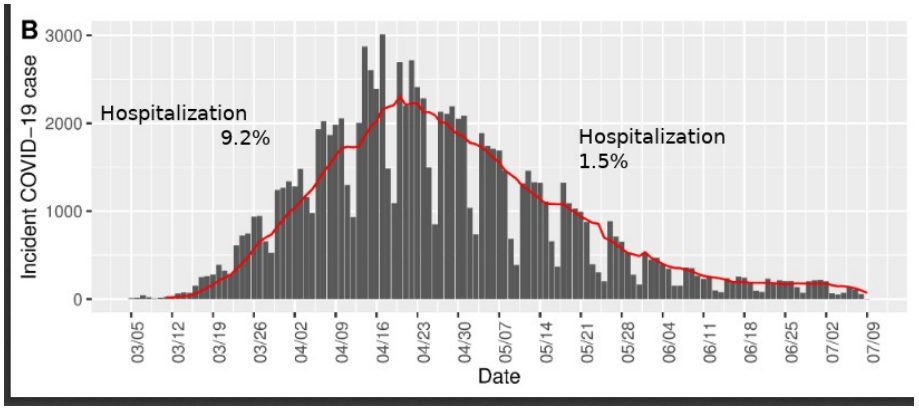

ছবি ২ : আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের করোনা চিত্র ওপরে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া।

কিন্তু কোনো গবেষণালব্ধ প্রমাণ কি আছে, যে এই অতিমারী যত এগোচ্ছে, তত ভয়াবহতা কমছে? হ্যাঁ, আছে। আগস্টের মাঝামাঝি লেখা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর করা একটি গবেষণা পত্রের খসড়া বলছে, অতিমারীর ক্ষেত্রে পরের দিকে আক্রমণের ভয়াবহতা অনেক কমে যাচ্ছে।(ম্যাসাচুসেটসে ১৫ এপ্রিলের পর, যেদিন ওখানে পিক বা সর্বোচ্চ দশা বলা হয়। ৫ মার্চ প্রথম কেস আসে। ৯ জুলাই অবদি সমীক্ষাটি চালানো হয়েছে।) হাসপাতালে ভর্তি হওয়া কমে যাচ্ছে প্রায় ৬ গুণ (নিচের ছবি)। শুধু মাথা ধরা ছাড়া অন্য সব জটিলতাও কমে যাচ্ছে। এখানেও দেখা যাচ্ছে, একটি ভৌগলিক জনপদে গোষ্ঠী সংক্রমণের এক-দুই মাসের পর থেকেই ভাইরাসের ভয়াবহতা (ভাইরুলেন্স) অনেক কমে যাচ্ছে।

ভারতে অ্যান্টিবডি সমীক্ষাগুলি কী বলছে?

আমাদের দেশে অনেকগুলি অ্যান্টিবডি সমীক্ষা হয়েছে। এবং হয়েই চলেছে। সবচেয়ে বড়ো ‘জাতীয় সমীক্ষা’ দিয়েই শুরু করা যাক, যেটি মে মাসের শেষ সপ্তাহে হলেও যার রিপোর্ট বেরিয়েছে পিয়ার রিভিউ হয়ে এই সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে যত কেস রিপোর্টেড হয়েছে ভারতে (৬৫ হাজারের মতো), তার প্রায় ১০০ গুণ প্রাপ্তবয়স্ক (৬৫ লক্ষের মতো) সংক্রামিত হয়েছিল বা কোভিড ১৯ এর অ্যান্টিবডি পাওয়া গেছে। নাবালকদের ধরলে গুণিতক সংখ্যাটা আরো বেশি হবে। এখানে আবার বলে দেওয়া দরকার, যে কোনো অ্যান্টিবডি সমীক্ষাই নমুনা সমীক্ষা, পরম সংখ্যা নয় এটা, আনুমানিক সংখ্যা। মনে রাখা দরকার, এই সময় পুরোদমে দেশজোড়া লকডাউন চলেছে। যদিও এই সংক্রমণ দেশের মোট জনসংখ্যার বিচারে মাত্র ০.৭৩ শতাংশের মতো, এবং সেই ভাবে ধরলে প্রায় কিছুই নয়। এবং আরো বলা আছে, জেলা বিচারে যে সব জেলায় কোনো কেস ছিল না, বা প্রতি দশ লক্ষ জনসংখ্যায় পাঁচের কম ছিল, সেখানেও সংক্রমণ পাওয়া গেছে এবং তা ০.৬৫ শতাংশের সামান্য বেশি ও সামান্য কম।

এই সমীক্ষার একটি অংশ ওই রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়নি বলে অভিযোগ। সেটা হল ১০টি সুউচ্চ বা হটস্পট শহরের কনটেনমেন্ট জোনের নমুনা সমীক্ষা। অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য, এই সব জায়গায় ১৫ থেকে ৪৮ শতাংশ সংক্রমণ পাওয়া গেছে। দশটা হটস্পট জেলা হল – আমেদাবাদ (৪৮%), ভোপাল, কলকাতা, দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর, জয়পুর, মুম্বই (ধারাভি ৩৬%), পুনে, সুরাত। একটি রিপোর্টে আসে, কলকাতায় ১৪% সংক্রমিত। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ২.৫% সংক্রমিত।

পুনে শহরে ২০ জুলাই -- ৫ আগস্ট এই সময়কালে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অ্যান্টিবডি সমীক্ষা করা হয়, জুনের শুরুতে সবচেয়ে বেশি কেস (> ০.২%) যে সব অঞ্চলে তার মধ্যে থেকে পাঁচটা বেছে নিয়ে। দেখা যায়, ওই অঞ্চলগুলোতে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে গড়ে ৫১ শতাংশ সংক্রামিত হয়ে গেছে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই । যদিও এই উচ্চ কেস-এর অঞ্চলের মধ্যেও সংক্রামিত-র শতাংশের বৈচিত্র্য প্রবল, কোথাও ৬৫% তো কোথাও

৩৬% । যা থেকে বোঝা যায়, শহরে সংক্রমণ মোটেই সমসত্ত্ব নয়। পুনে শহরে ওই সমীক্ষার পরবর্তী দেড় মাসে দৈনিক কেস সংখ্যা প্রথম পনেরো দিন কিছুটা কমলেও তারপর ফের বাড়তে বাড়তে সমীক্ষার সময়ের দৈনিক কেস সংখ্যা ছাপিয়ে গেছে। যা অস্বাভাবিক নয়, কারণ সমীক্ষায় অপেক্ষাকৃত কম কেস (০-০.২%) যে সব অঞ্চলে, সেগুলো বাদ দেওয়া হয়েছিল। সেগুলো ধরলে সংক্রমণের শতাংশ একান্ন-র তুলনায় অনেক কমে যাবার সম্ভবনা।

মুম্বই শহরে সামগ্রিক বৈচিত্র ও সংক্রমণের বৈচিত্র মাথায় রেখে জুলাই মাসের প্রথম -দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি অ্যান্টিবডি সমীক্ষা করা হয় তিনটি ওয়ার্ডে। দেখা যায়, বস্তি এলাকায় ৫৬.৫% এবং বস্তি নয় এমন এলাকায় ১৫.৫% বাসিন্দার দেহে সংক্রমণ ঘটে গেছে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে। মুম্বইতে ৫৫% মানুষই বস্তিবাসী, তাই গড় সংক্রমণ ৩৮%। বা ৭৭ লক্ষ ৫৬ হাজার। ওই সময় কেস ছিল ৬০০০০। অনুপাত ১৩০।

দিল্লিতে এখনও অবদি তিনটি অ্যান্টিবডি সমীক্ষা হয়েছে। প্রথমটি হয় জুন মাসের শেষ দিকে এবং জুলাই-এর শুরুতে, ১১ টা জেলার থেকে। তাতে গড়ে ২৩.৪৮% সংক্রমণ পাওয়া যায় জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ অবদি। অর্থাৎ ৭১ লক্ষ। তখন কেস ছিল ৩০০০০। অনুপাত ২৩৭। ৮ টি জেলায় সংক্রমণ ২০% এর বেশি, এবং তিনটি জেলায় ২৭% অবদি সংক্রমণ পাওয়া যায়। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আরেকটি সমীক্ষা করা হয়, ১১ টি জেলা নিয়েই। তাতে দেখা যায়, জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ২৯.১% র দেহে সংক্রমণ। বা ৮৮ লক্ষ। তখন কেস ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার। অনুপাত ৮০। এই সমীক্ষায় দেখা যায়, দক্ষিণ পূর্ব দিল্লির সংক্রমণ ৩৩.২% এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির সবচেয়ে কম ১৬.৩% । আগের সমীক্ষায় শীর্ষে ছিল সেন্ট্রাল দিল্লি (২৭.৮৬%)। তৃতীয় সমীক্ষা হয় সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। তাতে দেখা যায়, আগস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ৩৩ % সংক্রমিত হয়েছে। তখন কেস ছিল ১ লক্ষ ৪৬ হাজার। অনুপাত ৬৮।

ওড়িশার বেরহামপুর শহরে আগস্টের ৩-৭ এ করা অ্যান্টিবডি সমীক্ষায় দেখা যায় ৩১ % সংক্রমিত হয়েছে জুলাই -এর দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে। অর্থাৎ প্রায় ১.২৬ লক্ষ। তখন কেস ছিল ৮০০ র মতো। অর্থাৎ ১৫৮ গুণ। চার লক্ষ জনসংখ্যার শহরে ২৫ টি ওয়ার্ডের মধ্যে কোথাও ৭ শতাংশ তো কোথাও ৬০ শতাংশ সংক্রমিত। শহুরে বস্তি এলাকায় গড় সংক্রমণের হার ৩৫ শতাংশ। ১৪ জুলাই ভুবনেশ্বরে যে সমীক্ষা হয়, তাতে দেখা যায় ১.৪% সংক্রমিত হয়েছে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ অবদি। তখন কেস সংখ্যা ছিল ২৩৩। সংক্রমিত ১৬৩১০। অনুপাত ৭০। ২৮-২৯ আগস্ট দ্বিতীয় সমীক্ষা হয় ভুবনেশ্বরে, তাতে দেখা যায় ৫.১৫% সংক্রমিত হয়েছে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ অবদি। ঐ সময় সেখানে মোট কেস ছিল ৩৫৭৩। আর সংক্রমিত ৬০,০০০। ফলে অনুপাত ১৭।

চেন্নাই শহরে ১৮-২৮ জুলাই এর মধ্যে ১৫ টি জোন-এর ৫১ টি ওয়ার্ডে সমীক্ষা হয়। তাতে দেখা যায় গড়ে ২১.৫% সংক্রমণ জুন মাসের মধ্যে। তবে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সংক্রমণের ভেদ প্রচুর, ২ থেকে ৫০ % অবদি। ওই জুন মাসের শেষে কেস সংখ্যা ছিল ৬০,০০০ এর মতো। আর সংক্রমিত ২৩.৬ লক্ষ। অর্থাৎ প্রায় ৪০ গুণ।

ইন্দোরে আগস্টের ১১ থেকে ২৩ এর মধ্যে যে সমীক্ষা হয় ৮৫ টি ওয়ার্ডে, তাতে দেখা যায়, ৭.৭৫% সংক্রমিত হয়েছে জুলাই-এর তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই, সংখ্যায় যা প্রায় ২ লাখ। তখন ইন্দোরে কেস সংখ্যা ছিল ৭০০০ এর আশেপাশে। অর্থাৎ, কেস-এর প্রায় ৩০ গুণ সংক্রমিত।

আমরা আগস্টের শুরুর দিকের অনুপাত দিল্লিতে দেখতে পাচ্ছি ৭০ এর কাছে। ইন্দোরে জুলাই এর শেষের দিকে অনুপাত ৩০। ভুবনেশ্বরে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ২০ র কাছাকাছি। বেরহামপুরে জুলাই এর দ্বিতীয় সপ্তাহে ১৫০ এর কাছে। চেন্নাইতে জুনের শেষে ৪০। এর মধ্যে দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই-তে সেই মার্চ মাস থেকেই গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে ধরে নেওয়া যায়। ইন্দোর ও

ভুবনেশ্বরে হয়নি, অনেক পরে । বেরহামপুরেও খানিক পরে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়েছে। সবদিক বিবেচনা করে আমরা আগস্ট মাসের প্রথম দিকে গোটা ভারতের ক্ষেত্রে সংক্রমণ ও কেসের অনুপাত দিল্লি ও ভুবনেশ্বর এবং বেরহামপুর (এক মাসে ভুবনেশ্বরের মতোই আড়াই গুণ কমবে অর্থাৎ দেড়শো থেকে ষাট হবে ধরে নিয়ে) এর গড় করছি। হল ৫০। এইটাই ধরা যেতে পারে জাতীয় অনুপাত। যে জাতীয় অনুপাত মে মাসের প্রথম দিকে ছিল ১০০। আরো ধরে নিচ্ছি, এই গড় সেপ্টেম্বর মাসেও একই থাকছে, এবং আগস্ট - সেপ্টেম্বর ও মে-র পার্থক্যের কারণ হল লকডাউন ও টেস্ট বাড়ানো। অতএব আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের পরিস্থিতি একই এই দুই পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু মে-র পরিস্থিতি আলাদা ছিল। সেক্ষেত্রে এখন (সেপ্টেম্বরের অর্ধেক পেরিয়ে) যখন কেস সংখ্যা ৫০ লক্ষ। তখন মোট জাতীয় সংক্রমণ ২৫ কোটির মতো। আমাদের দেশে জনসংখ্যা ১৩৮ কোটি ধরলে সংক্রমণ ১৮ % এর মতো। আইসিএমআর দেশজুড়ে ৭০ টি জেলায় দ্বিতীয় দফার সমীক্ষা করেছে আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ অবদি। সেটাতে আগস্টের প্রথম সপ্তাহের হিসেব পাওয়া যাবে, আগস্টের ১০ তারিখ কেস সংখ্যা ছিল ২৩ লাখের মতো। এর পঞ্চাশ গুণ হল ১১.৫ কোটি। অর্থাৎ, আমাদের হিসেব ঠিক থাকলে আইসিএমআর -এর দ্বিতীয় সমীক্ষায় বেরোবে, ৮.৩৩%এর মতো সংক্রমিত। যদি অন্য কিছু বেরোয়, সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের হিসেব সেই অনুযায়ী ঠিকঠাক করে নেবো। *(আপডেট : ১ অক্টোবর বর্তমান পত্রিকার খবর অনুযায়ী, এই শতাংশ বেরিয়েছে ৭.১% । আমরা আমাদের অনুমানের সঙ্গে প্রায় একই হওয়ার ফলে হিসেব একই রাখলাম।)*

আমাদের দেশে গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হতে আর কত দেরি ?

আমাদের দেশে লকডাউন শুরুর আগে বেসিক রিপ্রোডাকশন রেট ছিল ২ এর একটু বেশি। পরে লকডাউন শুরু হতে তা কমতে কমতে ১.৩ এর কাছাকাছি চলে এসেছে। এর থেকেও প্রমাণ হয় ভাইরাস তার ভাইরুলেন্স হারাচ্ছে। যদি ২ হয়, তাহলে গোষ্ঠীবদ্ধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য প্রয়োজন ৫০ % সংক্রমণ। যদি ১.৫ হয়, তাহলে ৩৩.৩৩ % এর মতো। যদি ১.২৫ হয়, তাহলে ২০% এর মতো। কিন্তু নানা জায়গায় দেখা যাচ্ছে, সংক্রমণ ৩০% পেরিয়ে গেলেও কেস পিক করেনি। ফলতঃ বেসিক রিপ্রোডাকশন রেট লকডাউন চেপে বসার আগের সময়কালেই হিসেব করতে হবে। মার্চের ২ তারিখ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত রিপ্রোডাকশন রেটের সাপ্তাহিক হিসেবের গড় ২.২৪। অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য প্রয়োজন ৫৫% সংক্রমণ। যদি মার্চের শেষ সপ্তাহটা বেসিক রিপ্রোডাকশন রেটের গড় থেকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে মার্চের ২ থেকে ২৩ তারিখ অবদি বেসিক রিপ্রোডাকশন রেট ছিল ২.৩৪। সেক্ষেত্রে **আমাদের দেশে গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য দরকার ৫৭% সংক্রমণ।**

এখানে আমরা দুটো জিনিস ধরে নেব। এক, কেস ও সংক্রমণের অনুপাত একই থাকবে অন্ততঃ আগামী দুই তিন মাস। যেহেতু টেস্টিং ওপর ও আনলকের ওপর এই অনুপাত নির্ভরশীল মূলতঃ ধরে নেওয়া যেতে পারে, আগস্ট মাসে এবং সেপ্টেম্বর মাসে এই দুটির যে পরিস্থিতি ছিল, আগামী আড়াই-তিন মাসও প্রায় একই রকম থাকবে, অর্থাৎ শীত আসা পর্যন্ত (পৌষ/ ডিসেম্বর)। দুই, ভয়াবহতা কমার ফ্যাক্টর আমরা আপাততঃ মাথায় রাখব না। পরে এই ফ্যাক্টর টা যোগ করব। এখানে আরেকটা ফ্যাক্টরও গুরুত্বপূর্ণ। পিক আসা এবং গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিরোধক্ষমতায় পৌঁছনো একই সময় না-ও হতে পারে, যদিও তা খাতায় কলমে এক হবার কথা।

দিল্লির অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাচ্ছে , বিশের কোঠায় এক মাসে ৫% এর বেশি সংক্রমণ বাড়ছে, তিরিশের কোঠায় ৪% ,মাসে। সেই অনুযায়ী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সংক্রমণ ৩৮% হতে চলল, কিন্তু এখনও দিল্লির পিক আসেনি। কেস বেড়ে চলেছে। মুম্বই-য়ের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সেই জুন মাসের মাঝামাঝি সংক্রমণ ৩৮% তে পৌঁছে গেছে, কিন্তু এখনও কেস বেড়ে চলেছে, অতএব পিক আসেনি। ধরে নেওয়া যায়, চল্লিশের কোঠায়

মাসিক সংক্রমণ বৃদ্ধির শতাংশ আরো কমবে। আরো এক কমিয়ে তাকে ৩ % নেওয়া হল। সেক্ষেত্রে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তা পৌঁছেছে ৪৮% এ। পিক আসেনি। এবার পুনের অভিজ্ঞতার দিকে নজর দেওয়া যাক। পুনের নভিপেট-পার্বতী প্রভাগ-এ ২৩ জুন পিক এসেছে। সেখানে ১৫ জুলাই (৫ আগস্ট সমীক্ষা করা হয়) সংক্রমণ ছিল ৫৬.৭%। পঞ্চাশের কোঠায় মাসে ২% বাড়ে সংক্রমণ ধরলে, ২৩ জুন পিক-এর সময় নভিপেট-পার্বতী প্রভাগ-এ সংক্রমণ ছিল ৫৫ % । ইয়েরওয়াদা-য় আবার দ্বিতীয় পিক এসেছে ৫৫% সংক্রমণের পরে।

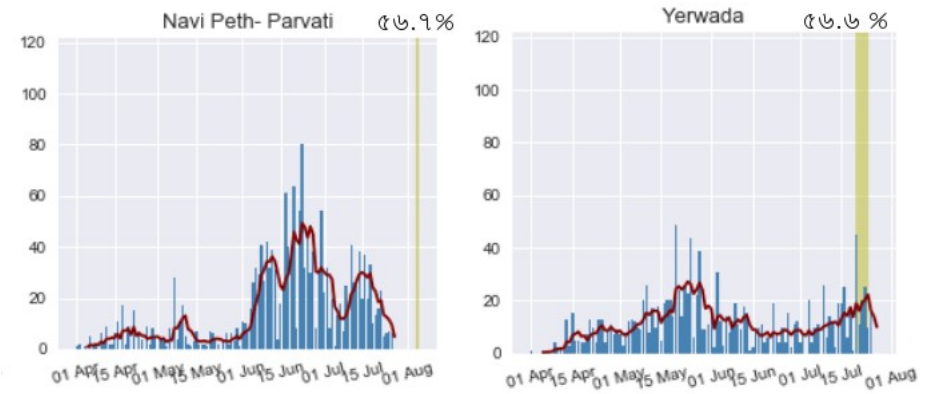

ছবি ৩ : পুনে শহরের দুটি ওয়ার্ডের করোনা চিত্র। অয়াই অক্ষ বরাবর কেস সংখ্যা।

ফলতঃ, ধরে নেওয়া যেতে পারে, অন্ততঃ ৫০% এর কোঠায় সংক্রমণ না পৌঁছনো অবদি পিক আসবে না। আসলে ফের দ্বিতীয় পিক তৈরি হবে। **ফলে আমাদের দেশগতভাবে আরো অন্ততঃ আট থেকে দশ মাস লাগবে পিক আসতে**। কীভাবে? অক্টোবরের মাঝামাঝি সেপ্টেম্বর মাঝামাঝি থেকে ৭% বেড়ে হবে ২৫%। নভেম্বরের মাঝামাঝি হবে ৩০%, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হবে ৩৪%, জানুয়ারির মাঝামাঝি হবে ৩৮%, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি হবে ৪২%, মার্চের মাঝামাঝি হবে ৪৫%, এপ্রিলের মাঝামাঝি হবে ৪৮%, মে মাসের মাঝামাঝি হবে ৫১%, জুন মাসের মাঝামাঝি হবে ৫৩%, জুলাই মাসের মাঝামাঝি হবে ৫৫%।

এইবার আমরা যে দুটি জিনিস ধরে নিয়েছিলাম, সেগুলি ফ্যাক্টরাইজ করব। এক) কেস ও সংক্রমণের অনুপাত একই থাকবে। বা টেস্টিং ও আনলক একই থাকবে। এক-ক) টেস্টিং একই থাকবে না। খুব সম্ভবতঃ আগামী দুই তিন মাস টেস্টিং একই থাকবে। তারপর কমে যাবে। সেক্ষেত্রে সংক্রমণ ও কেসের অনুপাত অনেক বেড়ে যাবে। তখন কেস-এর 'পিক' কাছে চলে আসবে, জাস্ট কম টেস্টিং এর জন্য। তবে এটা নিতান্তই সরকারের নীতি এবং মানুষের বিরক্তি -র ওপর নির্ভর করবে। যদি টেস্টিং একই রেটে চলে, তাহলে ওই ৮ বা ১০ মাস লাগবে পিক আসতে। এক-খ) আর আনলক আরেকটা ফ্যাক্টর। এবং এই ফ্যাক্টরটা আরো প্রবল। আনলক প্রক্রিয়া বেড়েই চলেছে। ফলতঃ আমরা যে জুন থেকে সেপ্টেম্বর অবধি ধরছিলাম, মাসিক সংক্রমণ বৃদ্ধির হার বিশের কোঠায় ৫, ত্রিশের কোঠায় ৪, চল্লিশের কোঠায় ৩, এবং পঞ্চাশের কোঠায় ২ -- এটা বেড়ে যাবে। যদি এক করে বেড়ে যায় প্রতি মাসে, তাহলে মার্চের মাঝামাঝি এটা দাঁড়াবে ৫০% এবং মে মাসের মাঝামাঝি দাঁড়াবে ৫৬% এবং **মার্চ-এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে পিক চলে আসবে**। দুই) ভয়াবহতা কমতে থাকবে। এই ফ্যাক্টরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন? সেক্ষেত্রে এর সংক্রমণ চলতে থাকলেও যারা সংক্রমিত হচ্ছে, তার মধ্যে আক্রান্ত খুবই কমে যাবে। ওপরে আলোচনায় আমরা দেখেছি, আক্রান্ত কমছে। এই আক্রান্তের পয়েন্টটা বিশদে এবার আলোচনা করা যাক।

ভয়াবহতা কমার ব্যাপারে আমাদের দেশে লকডাউন পালনে বা ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ায় যে ভৌগলিক বৈচিত্র্য দেখা গেছে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এমনিতে ভাইরাসের ভয়াবহতা দু'মাস কোনো এক জায়গায় অতিমারী চললেই কমতে শুরু করে ধরে নিলে, এবং এই মুহূর্তে দেশের সমস্ত জায়গায় ভাইরাসের গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়ে গেছে ধরে নিলে আর দুই মাসের মধ্যেই কেস সংখ্যা একই হারে বাড়লেও জাতীয় আক্রান্ত (আইসিইউ+অক্সিজেন+ভেন্টিলেটর) কেস ৬% থেকে কমে ১% এর কমে চলে যাবার কথা। কিন্তু তা কি হয়েছে? আমরা কিন্তু এখনও জানি না। এখানে প্রতিটি জেলার তথ্যও পর্যাপ্ত নয়। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত / ওয়ার্ডের তথ্য প্রয়োজন। দেশের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত / ওয়ার্ডে কি কেস পাওয়া গেছে? যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে / ওয়ার্ডে কেস তেমন না পাওয়া যায় তার মানে সে সব জায়গায় এখনও গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়নি। এই হিসেবটা পঞ্চায়েত বা ওয়ার্ড না করে স্থানীয় বাজার ধরে করাই বেশি ভালো। কারণ, গ্রাম হোক বা শহর, একমাত্র বাজার হল সেই জায়গা যেখানে লোকে জড়ো হচ্ছে এবং গোষ্ঠী সংক্রমণ সবথেকে বেশি হবার সম্ভবনা এই বাজার থেকেই। কিন্তু 'অমুক বাজারে যারা বাজার করতে আসে, তাদের মধ্যে কতজন কেস পাওয়া গেছে' -- এইটা তথ্যবদ্ধ করা খুব মুশকিল। বদলে গ্রামের নাম বা ওয়ার্ডের নাম কেস-এর তথ্যে (ঠিকানা থেকে) পাওয়া যাবার সম্ভবনা বেশি। এই তথ্যটি যোগাড় করলে বোঝা যাবে কোথায় কোথায় এখনও গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়নি। যে সব জায়গায় গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়ে গেছে, তার মোট জনসংখ্যার সঙ্গে দেশের মোট জনসংখ্যার অনুপাতের একটি রাশি করা প্রয়োজন। যদি এই রাশিটার সময়সারণী পাওয়া যায়, তাহলে আন্দাজ করা যায় যে সেটা হবে একটা এক্সপোনেনশিয়ালি বৃদ্ধি পাওয়া একটা কার্ভ। সেটি যদি এক-এর কাছাকাছি চলে আসে, তাহলে খুবই ভালো। তাহলে ধরে নেওয়া যায়, আগামী দুই মাস পর থেকে করোনার ভয়াবহতা চলেই যাবে প্রায়। আক্রান্ত কমে যাবে অনেক। কিন্তু আমাদের ধারনা, এটি এক এর কাছাকাছি পৌঁছয়নি, এবং পৌঁছতে দেরিই আছে। জুনের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এই সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ অবদি যে কেস পিছু আক্রান্তের শতাংশ কমেনি, বরং মাঝখানে কিছুটা কমে (আগস্টের ২০ তারিখ ছিল ৪.৮%) গিয়ে আবার বেড়েছে, সেটা দেখায়, গোষ্ঠী সংক্রমণ হওয়া জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি এই সময়ে এক্সপোনেনশিয়াল ছিল।

যদি এই মাসের মধ্যে সমস্ত ওয়ার্ড/গ্রাম পঞ্চায়েতে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে আগামী দুই মাস পর থেকেই দেশে আক্রান্ত কমতে থাকবে। এবং ছয়মাস পরে আক্রান্ত ১ শতাংশের নেমে যাবে বলেই আমাদের ধারনা। সেক্ষেত্রে তখন আক্ষরিক অর্থে পিক না আসলেও ভাইরাসটি এলেবেলে হয়ে যাবে। **২০২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে নয়া করোনা ভাইরাস আর দশটা ফ্লু ভাইরাসের মতো এলেবেলে হয়ে যাবে।**

করোনা অতিমারী-র নয়, দেশের মুমুর্ষু অর্থনীতি-র সুরাহা করোনা-র গণ টীকা

করোনার টীকা তৈরির তিনটি দশা থাকে। তার মধ্যে তৃতীয় দশাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় সাপেক্ষ। এখনও অবদি যতগুলি টীকা তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে রাশিয়ার গামালেয়া টীকা বাদে আর কোনোটাই সরকারি ছাড়পত্র পায়নি। ছাড়পত্র পেতে তৃতীয় দশার ট্রায়াল শেষ করতে হবে। এই সময় সাপেক্ষ ট্রায়ালটি শেষ করতে সাত মাস লাগে। সেপ্টেম্বরের আগে কোনো টীকারই তৃতীয় দশা শুরু হয়নি। তাই ধরেই নেওয়া যায়, শেষ করতে করতে অন্ততঃ ২০২১ সালের মার্চ মাস হয়ে যাবে। রাশিয়ার টীকাটিও তৃতীয় দশা শুরু করেছে সেপ্টেম্বরে। আগেভাগে রাশিয়ার সরকারি ছাড়পত্র পেয়ে গেলেও তৃতীয় দশা শেষ হবার আগে ভারত সরকারের ছাড়পত্র পাবে না, আশা করা যায়। মার্চে ছাড়পত্র পেলে তারপর শুরু হবে গণহারে উৎপাদন। সেই উৎপাদন করতেও অনেক সময় লাগবে। **অর্থাৎ সব কিছু ঠিকঠাক চললেও আগামী মার্চ মাসের আগে টীকা আসছে না।**

এরই মধ্যে ভারতে টীকা তৈরিতে অগ্রগণ্য সংস্থা পুনের সিরাম ইনস্টিটিউট থেকে জানানো হয়েছে, গণ টীকাকরণের জন্য প্রয়োজন ২০২১ সালের মধ্যে সরকারি তহবিলের ৮০ হাজার কোটি টাকা। অথচ আমাদের দেশে স্বাস্থ্য খাতে মোট খরচ হয় ৬৭ হাজার কোটি টাকার মতো। ফলতঃ বাস্তবতঃ গণ টীকাকরণ হয় অসম্ভব, অথবা তা স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অন্যান্য দিকের খরচ কাটছাঁট করতে বাধ্য।

আগের সার্স কোভ ভাইরাসটি, যেটি ২০০২-০৩ সালে চীনে দেখা গেছিল, সেটি ছিল অনেক বেশি প্রাণঘাতী এবং তার সিম্পটম দেখলে বোঝা যেত। ফলে আক্রান্তদের আলাদা করা সহজ হচ্ছিল। তাছাড়া দেখা গেছিল ভাইরাসটি কয়েক মাসের মধ্যেই এলেবেলে হয়ে পড়েছে। তাই আগের ভাইরাসটির টীকা লাগেনি। কিন্তু এই সার্স কোভ ভাইরাসটি অনেকের মধ্যেই সিম্পটম ছাড়াই ছড়াচ্ছে এবং এর প্রাণঘাতী প্রবণতাও কম। যদিও এর টীকা হয়ত প্রয়োজন আছে অতিমারী শেষ করার জন্য, কিন্তু আমাদের দেশে গণহারে কোভিড টীকাকরণ কতটা যুক্তিযুক্ত?

এই নতুন করোনা আসার আগেই বিশ্বজুড়ে এবং আমাদের দেশে অর্থনীতি ছিল সংকটে। এই অতিমারীর লকডাউনের মধ্যে দিয়ে সেই সঙ্কট চরম আকার ধারন করেছে। এই সঙ্কট মূলতঃ চাহিদার সঙ্কট এবং বাজারের সঙ্কট। অতিমারীর জুজু দেখিয়ে টীকার ছদ্ম-বাজার তৈরি করে সেই চাহিদার সঙ্কট তথা বাজারের সঙ্কটকে কাটিয়ে ওঠার একটি অপচেষ্টা নয় তো? যা প্রয়োজন নেই, তাকে প্রয়োজন বলে চালিয়ে অর্থনীতিকে তার ওপর দাঁড় করালে যা তৈরি হয় তা হল বুদবুদ অর্থনীতি। সেই বুদবুদ অর্থনীতি দেশ বা মানুষের কোনো উপকার করে না। কতিপয় সুযোগসন্ধানী ধনী ও অতিধনীর পকেট ভর্তি করে। দেশ তথা দেশের মানুষকে আরো দেউলিয়া করে দেয়।

আমাদের দেশের সিরাম ইন্সটিটিউট বিশ্বের সর্ববৃহৎ টীকা প্রস্তুতকারক। তাদের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী কোভিড টীকার বাণিজ্যের ব্যাপারে একটি হিসেব পাওয়া যাচ্ছে। কোভিড টীকার পরিস্থিতিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে এরকম -- আমেরিকা এবং ইংলন্ড তাদের নিজেদের দেশে তৈরি হওয়া টীকার বেশিরভাগটাই বুক করে রেখেছে, যার সংখ্যা তাদের জনসংখ্যার অনেক গুণ। বোঝাই যায়, তারা অনেকবার করে টীকা দিতে হবে ধরে নিয়ে এটা করেছে। চীন তাদের জনগণের ওপর টীকাকরণ শুরু করে দিয়েছে সেই জুলাই মাস থেকে এবং এটা তারা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমতি নিয়েই। রাশিয়া যে টীকা তৈরি করছে, সেই গামালেয়া ইন্সটিটিউটের টীকার ওপর ভরসা করা মুশকিল হচ্ছে। এমতাবস্থায় ভারতবর্ষ যে সারা বিশ্বে টীকা সাপ্লাই-এ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে, সেটা অনস্বীকার্য। বিশ্বে গরীব দেশগুলি যাতে টীকা পায়, তার জন্য একটি দাতা-সংস্থা তৈরি আছে। বিল গেটসের মতো ধনকুবেররা তার নির্মাতা। এই যে টীকাকরণে অনুদান দেওয়া, বা টীকা অনুদান হিসেবে দেওয়া, এগুলিতে নানা শর্ত থাকে। এর মাধ্যমে যারা টীকা নিচ্ছে, তাদের জৈব-পরিচিতি হাতে আসে। যা ভবিষ্যতে প্রতিটি মানুষের জৈব-প্রোফাইলের ব্যাঙ্ক তৈরি করতে সহায়তা করবে। ভারতের ক্ষেত্রে আধার কার্ডের নির্মাতা নন্দন নিলেকানি বলেই দিয়েছেন, এই গণ টীকাকরণের সুযোগে প্রতিটি মানুষের জৈব-তথ্য বাগিয়ে নেওয়া হোক। জৈব তথ্য মানে হল একটা মানুষের ব্লাড গ্রুপ থেকে শুরু করে তার কোনো ক্রনিক রোগব্যাধি আছে কি না এইসব। আরোগ্য সেতু অ্যাপের মধ্যে দিয়ে এই জৈব-তথ্য হাতিয়ে নেওয়া জোর কদমে শুরু হয়ে গেছে অবদি। আর কে না জানে, তথ্যই হল আগামী দিনের পুঁজি। স্বাভাবিকভাবেই নন্দন নিলেকানি বলে দিয়েছেন, স্বাস্থ্য ব্যবসার সুবর্ণ দিন হল এই টীকাকরণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও টীকার ব্যাপারে উদ্‌গ্রীব। টীকা এলে এবং দিয়ে দিলে তাদের নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা পড়বে। তারা যে কিছুই করতে পারেনি কোভিড অতিমারী মোকাবিলায়, কিছু অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান বিতরণ ছাড়া, অতিমারী যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে দশ গোল দিয়েছে, সেই স্মৃতি ঢাকা পড়বে টীকা এলে এবং তার সামগ্রিক বিতরণ হলে। এই সংস্থার মুখ্য গবেষক সৌম্য স্বামীনাথন জানিয়ে দিয়েছেন, ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ কার্যকরী হলেই

টীকাপ্রদান করা যেতে পারে। এই সংস্থার প্রধান গুয়েতেরস বারবার বলছেন, ‘জনগণের টীকা’ প্রয়োজন। অর্থাৎ যে টীকা সবাই নিতে পারবে। এবং আবিশ্ব টীকাকরণ প্রয়োজন। কারণ হিসেবে উনি বলছেন, শুধু নিজের দেশের লোকেরা টীকা নিয়ে কোভিড প্রতিরোধী সক্ষমতা অর্জন করলেই হবে না। সারা বিশ্বের লোককেই তা করতে হবে। অতিমারী দূর করতে এটা দরকার। তিনি ঠারে ঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ফ্রি-তে গরীবদের টীকাকরণ করানো দরকার। এমনকি নিজের দেশের জন্য টীকা বুক করে রাখা-কে 'ভ্যাক্সিন্যাশনালিজম’ বলে গালি দিয়েছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে গিয়ে , ‘ভারত সারা পৃথিবীকে কোভিড টীকা সরবরাহ করবে’ বলে শুনিয়ে এসেছেন মোদি। পুনের সিরাম ইন্সটিটিউটের সঙ্গে এবং অন্যান্য টীকা প্রস্তুতকারক সংস্থার সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তি হয়েছে, যত টীকা তারা তৈরি করবে, তার অর্ধেক দেশের জন্য বরাদ্দ থাকবে, বাকি অর্ধেক রপ্তানি করবে সংস্থাগুলি। সিরাম ইন্সটিটিউট অক্সফোর্ডের বানানো করোনা টীকার দাম ধার্য করেছে ২২৫/- । যদিও এটা সবচেয়ে দামী টীকা। এখনও পর্যন্ত ভারতে যে সমস্ত টীকা সরকার এই টীকাপ্রস্তুতকারকদের থেকে কেনে, তার সর্বোচ্চ দাম ৬০/- । এই করোনা টীকার দাম ধার্য হয়েছে অনেক বেশি। সব দিক দেখে শুনে মনে করা হচ্ছে, সরকার গরীবদের এই টীকা বিনামূল্যে দিলেও (টীকার প্রস্তুতি, সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রদান মিলিয়ে মোট খরচ ১০০০/- হতে পারে) বাকি মানুষকে এই টীকা দাম দিয়ে কিনতে হবে।

এখনও অবদি বোঝা যাচ্ছে না, কোভিড টীকা একবার নিলে কতদিন তা দিয়ে চলবে, কতদিন পর ফের টীকা নিতে হবে। চীনে সম্প্রতি মার্চ মাসে যাদের টীকা দেওয়া হয়েছিল, তাদের ফের টীকা দেওয়া হয়েছে, কারণ আগের টীকা দুর্বল হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ ছ'মাস পর পর। রাশিয়ার টীকার যে গবেষণা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, একুশ দিন পর বুস্টার ডোজ দিতেই হবে কিছুটা দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য। ধরে নেওয়া যাক, বছরে একটা করে ডোজ নিতে হবে টীকার। যদি বছরে ষাট কোটি টীকা বিক্রি হয় ভারতে, তাহলে তার জন্য ৬০,০০০ কোটি টাকার বাজার। যা দেশের বার্ষিক স্বাস্থ্য বাজেটের সমান প্রায়। সরকারের চুক্তি মতো, যদি আশি কোটি টীকা দেশে থাকে (অর্থাৎ কুড়ি কোটি টীকা সরকার ভর্তুকি দিয়ে বিতরণ করবে বিশ হাজার কোটি টাকা খরচ করে প্রতি বছর), তাহলে আরো আশি কোটি টীকা বিদেশে রপ্তানি হবে। সেক্ষেত্রে আরো আশি হাজার কোটি টাকার রপ্তানির বাজার।

করোনার আতঙ্ক টিঁকে থাকা ভারতবর্ষের পুঁজিপতিদের এবং মন্দাবিধ্বস্ত অর্থনীতি নিয়ে বিপাকে পড়া মোদি সরকারের আজ সবিশেষ প্রয়োজন। ভ্যাক্সিন্যাশনালিজমের সমালোচনার আড়াল থেকে গোঁফে তা দিচ্ছে ভ্যাক্সিক্যাপিটালিজম।